তিনটে ফটোগ্রাফ

চিরঞ্জয় চক্রবর্তী

দশবছর বয়সে তোলা তিনটে ফটোগ্রাফ

এই সেই টেবিলটার ফটোগ্রাফ। ছোটোবেলায় এতেই আমি লেখাপড়া করতাম। আমার পড়ার টেবিল। এটা যেদিন আমাদের বাড়ি এল সবাই জানল তপনদা আমাকে উপহার দিয়েছে। টেবিলটা দেখে আমার এত আনন্দ হয়েছিল যে, একবারো জিজ্ঞাসা করিনি ও ভাবিনি, এখন কেন দিল? আমার তো জন্মদিনের অনেক দেরি আছে। টেবিলের উপরে সুন্দর নীল রঙের সানমাইকা দেওয়া, টেবিলের উপর দিয়ে হাতটা এপাশ থেকে ওপাশ সরালে কীরকম যেন একটা সুড়সুড়ির ভাব আসে, এটা আবিষ্কার করতে আমার বেশিক্ষণ সময় লাগেনি। টেবিলটার ডানদিকেপরপর তিনটে ড্রয়ার, চাবি দিয়ে বন্ধ রাখা যায়, এই টেবিলটা আমার, এই ড্রয়ারগুলো আমার, সম্পূর্ণ নিজস্ব একটা জায়গা হল। মা আমাকে একটা ড্রয়ারের চাবি দিয়েছিল। অন্যগুলো মা নিজের দখলে রাখল মার সঙ্গে আমার নিজস্বতা পৃথক হল।

টেবিলটা আনার পরদিন কুচবিহার থেকে বড়মামা এলেন। তিনি ওই ঘরেই থাকবেন। সমস্যাটা হল পরদিন সকালে। তিনি হাতঘড়ি টাকাপয়সা, ট্রেনের টিকিট সব উপরের ড্রয়ারে রেখেছিলেন। সকালে উঠে দেখেছেন নেই। ওই ড্রয়ারের একটা চাবি আমার কাছে অন্যটা মার কাছে। আমি তখনো ব্যবহারই করিনি। অথচ আমাকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা শু হল। কীভাবে হল, কেন হল, কী দরকার ছিল বড়মামার জিনিসগুলো চুরি করার? আমি তোঅবাক। আমি কেন এসব করতে যাব? আমি যত বলছি জানি না, বাবা, মা, কাকা, কাকিমা সবাই সমস্বরে বলছে, তুই ছাড়া এ কাজ কে করবে? চাবি তোর কাছে। সেই মুহূর্তে কিছু বুঝে ওঠার আগেই বলেছিলাম চাবি তো মার কাছেও আছে।

এইসব কথার মধ্যে সবাই আসছে, উপরের ড্রয়ারটা খুলছে, কয়েকটা খুচরো পয়সা ছাড়া কিছু পাচ্ছে না। সব শেষে যখন বড়মামা নিজে খুলল, তখন খুচরো পয়সাও নেই। সব ফাঁকা সবাই আরো হতাশ হল।

আমাদের ঘরে জ্যাঠা, কাকা, কাকিমা, মা, বাবা সবাই চুপচাপ বসে আছে। কেউ কোনো কথা বলছে না। সবার শ্যেনদৃষ্টি আমার প্রতি, আমি কী বলতে চাইছি। বড়মামা কী ভাবছে, এ বাড়িতে সবাই চোর, যে যে ড্রয়ার খুলছে কিছু না কিছু নিয়েছে, নিতে নিতে এখন একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে। অন্যদিকে মা কেঁদেই চলেছে। বাবা, বড়মামা সবাই বলছে এতে কাঁদার কী আছে? জিনিস চলে গেছে আবার হবে, কিন্তু নিজেদের ঘরের ভিতর থেকে এরকম একটা ঘটনা কী ভাবে ঘটতে পারে এটাই সবাই ভেবে উঠতে পারছে না। ব্যাপারটা কে ঘটাতে পারে? ক্ষোভ, দুঃখ, অপমান সত্ত্বেও সেই অনুসন্ধানে সবাই ব্যস্ত আছে।

আমাকে সন্দেহ করার একটাই কারণ আছে। আমাদের নীচের তলায় যে বলাইকাকারা থাকে, ওদের বাড়িতে কিছুদিন আগে কেউ কেউ বেড়াতে এসেছিল। যারা বেড়াতে এসেছিল, তাদের হাতে একহাঁড়ি রসগোল্লা ছিল। আগে তো কাগজের ব্যবহার ছিল না, শালপাতা দিয়ে হাঁড়ির মুখ চাপা দেওয়ার পর রঙিন দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হত। সেই দড়িতে আঙুল বাঁধিয়ে লোকে হাঁড়ি দোলাতে দোলাতে আত্মীয় বাড়িতে যেত। সেদিন বিকেলে খেলতে যাওয়ার সময়ে দেখি মিষ্টির হাঁড়িটা বারান্দায়। কেউ কোথাও নেই। বলাইকাকার মেয়ে গৌরীও আমাদের সঙ্গে খেলত। আমি গৌরী, চঞ্চল, স্বপন সবাই

মিলে হাঁড়িটা নিয়ে ভূতের গলিতে চলে গেছিলাম। তখনো আমাদের হাত ছোটো ছোটো, দড়ির ফাঁক দিয়ে ঢুকে যেত, রসগোল্লা বের করতে আমাদের কোনো অসুবিধাই হয়নি। ভূতের গলিতে বসে আমরা হাঁড়ি পরিস্কার করে ফেলি। ত ারপর হাঁড়িটা যেখানে ছিল সেইখানাটায় রেখে আসি। বলাইকাকার বৌ হাঁড়ি ঘরে নেওয়ার সময়ে বুঝতে পারেন ফাঁক া। তিনি অবাক হয়ে যান, আত্মীয়রা ফাঁকা হাড়ি নিয়ে এসেছে? বলাইকাকা, কাকিমা আর সবাই মিলে যখন বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছে, গৌরী পাশেই ছিল, চুপচাপ শুনছিল, তারপর শুভবুদ্ধির উদয় হওয়ায় বলে ফেলেছিল, রসগো ল্লাগুলো নাকি আমার বুদ্ধিতে সবাই চুরি করে খেয়েছে। খেলসবাই আর দোষ হল আমার। তাই বড়মামার সবকিছু হা রিয়ে যাওয়ার পর আমাকেই দোষী হিসাবে শনাক্ত করতে কোনো অসুবিধা হয়নি। অথচ বড়মামার ঘটনাটার আমি কিছুই জানি না।

খাটের পায়ার সঙ্গে মায়ের চুলবাঁধা ফিতে দিয়ে আমাকে পিছমোড়া করে বেঁধে রাখা হয়েছে। সবাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, বড় হলে আমি খুনি হব। ছেলের ভবিষ্যৎ, লজ্জা, ক্ষোভ ইত্যাদি নিয়ে বিব্রত মা চোখের জল মুছে টেবিলের দ্বিতীয় ড্রয় ারটা খুলল। সেটাও পরিষ্কার। কিচ্ছু নেই। কিছু তো রাখাই হয়নি, থাকবে কী করে? আবার হতাশ হল বাবা বলল নীচেরটাও খোলো। বড়মামা ব্যঙ্গ করে বলল, খুলে কী হবে? কিছু পাবে নাকি? অন্যান্য যারাঘরের মধ্যে ছিল, তারা মুখে কিছু না বললেও তাদের ভঙ্গিমা বড়মামার সমর্থনেই গেছিল।

এই ব্যাপারটায় মা যেন একটু জোর পেল, নীচেরটাও খুলল। ড্রায়ায় খুলতেই মা পাল্টে গেল। আমার দিকে তাকাল, ঘর ভরতি লোকের দিকে তাকাল, তারপর কোনো কথা না বলে আমার পিছমোড়া বাঁধন খুলে দিয়ে হাউহাউ করে কাঁদতে ল াগল। আমায় ঘন ঘন চুমু খাচ্ছিল, বাঁ - হাত দিয়ে আমার ঘন চুলের মধ্যে বিলি কাটছিল। সে সময়ে ব্যপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। সবাই মিলে হুমড়ি খেয়ে নীচের ড্রয়ারটা দেখছিল। সবার কথায় বোঝা গেল বড়মামার সমস্ত জিনিস নীচের ড্রয়ারটায় পাওয়া গেছে। ঘরের সবাই আস্তে আস্তে নিজের ঘরে চলে গেল। সবার চলে যাওয়ার পর মার কান্নাটা বেড়ে গেল। এই সময়ে বড়মামা একটা সবুজ রঙের দু-টাকার নোট আমাকে দিয়েছিল মিষ্টি খাওয়ার জন্য। কী যে আনন্দ হয়েছিল সেই সময়ে ঠিক বলতে পারব না। কারণ ওইদিনই প্রথম আমি একটা সবুজ দু-টাকার নোট উপহার হিসাবে পেয়েছিলাম।

সেই রাতে মা কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বলেছিল, একটু দুষ্টুমি কম কর। দেখলিতো তুই কিছু না করলেও সবাই তোকেই চোর বলছিল। বলাইবাবুদের ঘরে ঢুকে তুই রসগোল্লা খেতে গেলি কেন? তোকে কি আমি রসগোল্লা দিই না? অন্য লে াকের জিনিস নিতে নেই। মা হয়তো আরো কিছু বলেছিল, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

দুই

এই সেই চেয়ারের ছবি। ওক কাঠের এই চেয়ারটা বাবা তার যৌবনে কিনেছিলেন। তখন তো চেয়ার ব্যবহার হত না, ম াদুরেই লোকে বসতে দিত। মহামহোপাধ্যয় কালীপদ তর্কাচার্য আমাদের বাড়িতে এসে কীসে বসবেন, তিনি আমাদের নিকট আত্মীয় হলেও তাঁকে বসানোর মতো উপযুক্ত কিছুর দরকার ভেবেই চেয়ারটা কেনা হয়েছিল। চারটে বাঘের প ায়ের উপর সুন্দর বাহারি ফুল ছাপা নরম গদি, পিঠের দিকে পাতলা ওক কাঠের কাজ করা, মাঝখানটায় নরম গদি। দেখলেই ইচছা হয় একবার বসি। ইচছা থাকলেও কাউকে বসতে দেওয়া হয়নি। কারণ যাঁর জন্য কেনা তিনি না বসা পর্যন্ত অন্য কেউ বসতে পারবে না।

শুনেছি তিনি যেদিন এসেছিলেন, চেয়ারের উপর একটা নতুন আসন পেতে দেওয়া হয়েছিল। তারপর তিনি বসলেন, কিছুক্ষণ পরেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন, চেয়ারটায় সমস্যা আছে। চারটে পায়া ঠিক নেই। আসনটা নিজেই মাটিতে পেতে বসেছিলেন।

পরদিন মিস্ত্রিকে ডাকা হয়, তিনি উল্টেপাল্টে অনেক্ষণ চেয়ারটা দেখালেন, চেয়ারের বিভিন্ন অঙ্গের মাপ নিলেন, তারপর বললেন, চেয়ার ঠিক আছে, ঘরের মেঝে উঁচুনিচু আছে।

বাবা কাকারা বিশ্বাস করেছিল, হতে পারে অনেকদিনের পুরনো বাড়ি তা কোথাও কোথাও মেঝে হয়তো বা বসে গেছে। মিস্ত্রির কিছু করার নেই। চেয়ার ঠিকমতো পাততে গেলে ঘরের মেঝে ঠিক করতে হবে। মিস্ত্রি চলে যাওয়ার পর এ ঘর, ও

ঘর সে ঘর বলতে গেলে বাড়ির সব ঘরেই পেতে পরীক্ষা করা হল। চেয়ারটা ঢক্‌ঢক্‌ করেছে। মিস্ত্রি ঠিক কথা বলেনি। সব াই বাবাকে পরামর্শ দিল, চেয়ারটা সারাও, না হলে এত সুন্দর একটা চেয়ারে বসারআনন্দটাই মাটি হয়ে যাচ্ছে। বাবা পুরনো মিস্ত্রিকে না ডেকে অন্য মিস্ত্রিকে ডাকল। তিনি এসে সব দেখে বললেন, চারটে পায়া ঠিক নেই। ছোটো বড় আছে। অনেক মাপজোক করে তিনি সারাদিন তলায় শিরিশ কাগজ ঘসে বললেন, এর বেশি কিছু হবে না। আমি কেন কেউই প ারবে না।

ঢক্‌ঢক্‌ করা স্বভাবটা চেয়ারের গেল না। বাবাও হাল ছেড়ে দিয়েছিল, এত সুন্দর চেয়ারটা একটু খুঁতের জন্য ব্যবহার কর া যাচ্ছে না। কিছুদিন চেয়ারটা কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকত।

একদিন হঠাৎ গুদেব এলেন। তাড়াতাড়ি চেয়ারের ঢাকনাটা সরিয়ে গুদেবের জন্য আসন পাতা হল। তিনি বসলেন, ঢকঢক করছে। তিনি আসনটা নীচে পেতে দিতে বললেন। তারপর নীচে বসলেন। ব্যাপারটা খুবই খারাপ, বাড়িতে ভালো চেয়ার আছে অথচ বিশিষ্ট মানুষেরা এসে বসতে পারছেন না। গুদেব বসতে না পারায় কুটুমরাও খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

আবার মিস্ত্রি ডাকা হল। তিনিও একই কথা বললেন, চারটে পায়া ঠিক নেই, ছোটোবড় আছে। তিনিও অনেকক্ষণ মাপজে াক করে সিদ্ধান্ত নিলেন, একটা বাঘের পা প্রায় আধ ইঞ্চি কাটতে হবে। আধইঞ্চি কাটলে সেটাকেআর রাঘের পা মনে হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে না। সবার আপত্তি সত্ত্বেও সামনের বাঁদিকের পা আধইঞ্চি কাটা হল।চেয়ারটা বসার উপযোগী হল।

এখন আর চেয়ারটা ঢক্‌ঢক্‌ করে না তবে দেখতে বিকট হয়ে গেছে। একটা কঞ্চি আর তিনটে বাঘের পা।চেয়ারটা ব্যবহার হয়, বিশিষ্ট লোকেরা এসে বসেন, কিন্তু মনে একটা খচখচানি থেকেই যায়। বাবা একদিন সবাইকে নিয়ে বসল, চেয়ার নিয়ে মিটিং

ছোটোকাকা বলল, চলে যাচ্ছে, অসুবিধা তো কিছু হচ্ছে না, শুধু শুধু ভাবনা চিন্তা করার কোনো মানে হয় না।

মা বলল, এত দাম নিয়ে এত সুন্দর একটা জিনিস হল, অথচ শোভাটাই থাকল না।

ঠাকুমা বলল, সাটিন দিয়ে ওর একটা ঢাকনা বানাও, পুরোটা ঢেকে দাও, তাহলে ব্যবহারও হল আবার দেখাও গেল ন া।

কাকিমা বলল, ঢাকলে আর থাকল কি ? আর পাঁচটা চেয়ারের মতোই হয়ে গেল।

বাবা বলল, দেখতে খুবই খারাপ লাগছে, একটা পায়া নষ্ট হওয়ায় পুরো সৌন্দর্যটাই হারিয়ে গেছে। মার কথা অনুযায়ী ঢাকনা বানালে সবটাই ঢাকা পড়ে যাবে। দেখি কী করা যায়।

পরদিন আবার মিস্ত্রি এল, তারপর অন্য তিনটে বাঘের পা সুন্দর করে কেটে ফেলা হল। চেয়ারের নীচের অংশটা একটা স াধারণ চেয়ারের রূপ পেলেও উপরের দিকটা যেরকম ছিল, সেরকমই থাকল। চেয়ারটা আর ঢকঢক করে না। সুন্দর স্বাভ াবিক হল।

সামস্যা হল অন্য জায়গায়, এমনিতেই এইসব চেয়ারগুলোর উচচতা কম, তার উপর পায়া ছোটো হয়ে যাওয়ায় বড়রা কেউ আরাম করে বসতে পারছে না। অনেকে অনেক ভাবে বসতে চেষ্টা করল, হল না। আবার সবার মনখারাপ। এত দা মি একটা আসবাব সামান্য ভুলের জন্য নষ্ট হয়ে যাক সেটা কেউই চায় না। বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য কেনা চেয়ারটা পুরে াপুরি বাতিল হয়ে গেল। সবার মন খারাপ। যেন কেউ মারা গেছে।

তিন

এটা পিতামহ দেওয়াল পঞ্জিকা। এগুলোর প্রতিদিন তারিখ বদল করতে হয়। আমাদের বাড়ির বাইরের ঘরে এটা ঝুলত। আমাদের হাত দেওয়ার অধিকার পর্যন্ত ছিল না। শুধু তারিখ দেখবে হাত দেবে না। পুরো পঞ্জিকাটাই ছিল বাংলায়। প্রতিদিন বার এবং তারিখ বদলে দিতে হত। এর ফলে আমরা বাড়ির সবাই বাংলা সন তারিখটাখুব ভালো বলতে পারত াম। এমনকি তিথিও বলতে পারতাম পঞ্জিকা না দেখে। বাংলায় তো এরকম পঞ্জিকা পাওয়া যায় না, হয়তো কেউ তৈরি করে দিয়েছিল বা নিজেরা কেউ বানিয়েছিল, ইতিহাসটা ঠিক জানি না, তবে পঞ্জিকাটা অসাধারণ ছিল।

সেদিনটা ঠাকুমার ছিল আশ্বিন যায় কার্তিক আসে ব্রত, পাড়ার অনেক মহিলারা এসেছিল ব্রতকথা শুনতেতারা চলে য

াওয়ার পর থেকে পঞ্জিকার অনেক অংশ উধাও হয়ে গেল। ঠাকুমা এসব বললে রেগে যেত, যারা ধম্মকম্ম করে তারা ব াপু এরকম নয়, অপরেরটা নিয়ে নেবে। তারা না নিক, ব্রতের আগে হোক বা পরে হোক একজন সময় বুঝে বেশ কিছু অংশ নিয়ে গেছে। অফিস থেকে বাড়ি এসে বড়জ্যাঠা এত রেগে গেছিল যে পঞ্জিকাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। আমি রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছিলাম। তারপর আমাদের ঘরে খাটের তলায় বসে পিতামহ পঞ্জিকা নিয়ে নড়াচড়া করতাম। চুরি হয়েছিল এক থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যাগুলো। মা রাত্রিরবেলা সব দেখে বলল, আমাদের ঘরে টাঙিয়ে দে কোনো অসুবিধা হবে না। টাঙিয়ে দিলাম। মা এগারো তারিখ থেকে উনিশ তারিখ পর্যন্ত বাঁদিকের একটাকে একটা ছোট্ট কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখত। কখনো যদি হওয়ায় কাপড়টা উড়ে যেত তিন তারিখ আমাদের ঘরে তেরো তারিখ হয়ে যেত।

চার

একদিন সবাই মিলে আমাকে চেয়ারটা দিয়ে দিল। আমার যা উচচতা তাতে একমাত্র আমিই ওই চেয়ারে বসতে পারি। চেয়ারটা আমার হল। তারপর একদিন তপনদা টেবিলটা দিল। আমার নিজস্ব তিনটে জিনিস ছিল টেবিলটা, চেয়ারটা অ ার পিতামহ পঞ্জিকাটা।

চেয়ারটা আমি সবসময়ে ঢেকে রাখতাম, কেউ এলে ঢাকনাটা তুলে দেখাতাম। মুখে বলতাম, চেয়ারটা সম্রাট ঔরাঙ্গজেব-এর আমলের, বাবা আমার জন্য কিনে এনেছে। কেউ বিশ্বাস করত না তা নয়, ওক কাঠের কাজটা সত্যি দেখার মতো ছিল। সবসময়ে ঢাকা থাকার জন্য চকচকে ভাবটাও নষ্ট হয়নি কোনোদিন।

টেবিলটা নিয়ে সবাইকে খেলা দেখাতাম, কোনো একটা জিনিস উপরের ড্রয়ারে রাখতাম তারপর চাবি দিয়ে বন্ধ করে দিতাম। সবাইকে বলতাম, টেনেটুনে দেখে নাও ঠিকমতো বন্ধ হয়েছে কিনা। বারকয়েক ফুঁ দিতাম, তারপর হাত ঘুরিয়ে খুলতাম, উপরের ড্রয়ারে কিছু নেই। সবাই অবাক হত। কাউকেই বলিনি ড্রয়ারে ফুটো আছে। মজা হত, সময় কাটত।

আমাদের বাড়িতে কেউ এলে, পিতামহ পঞ্জিকার ঢাকনাটা সরিয়ে দিতাম, অনেকেই অবাক হয়ে জিজ্ঞাসাকরত আজ তো এক তারিখ এগারো তারিখ রেখেছো? আমরা হাসতাম, তারপর মা বলত, এটা আমাদের নিজস্ব পঞ্জিকা। বাইরের লে াকদের এটা বললেও আমাদের বলত, পঞ্জিকাটা আমাদের হাতে নটা দিন অতিরিক্ত দিয়েছে, আমাদের সেইমতো ব্যবহ ার করতে হবে।

পাঁচ

বয়স সাতচল্লিশ, পেশায় ফেরিওয়ালা, বারো বছর পর বাড়ি এসেছি।

ঢোকার সময়ে পাঁচ বছরের ছোট্ট ভাইঝি সেজেগুজে ভরতনাট্যমের মুদ্রায় স্বাগতম জানিয়েছে। ও যে ভরতনাট্যম শেখে অ ামি জানতাম না, ভাই তো এত ভালো তবলা বাজায় আমাকে কেউ কোনোদিন বলেনি, অতিথি এলে যেরকম আপ্যায়ন হয়, আমার সঙ্গে অনেকটা সেইরকম ব্যবহার হচ্ছে, সবাই দৃষ্টি রাখছে যাতে কোনোরকম ত্রুটি না হয়। ভাইপো ভাইঝির া পায়ে পায়ে হাঁটছে। ওদের কাছ থেকে জানতে পারি আমাদের বাড়ির পিছনের জমিটা বিক্রি হয়ে গেছে, আমগাছগুলে ায় আম হয় না বলে কেটে ফেলা হয়েছে। বাবার রোলেক্স সাইকেলটার কথা ওরা জানে না। বাবা তো অনেক দিন বাড়ির বাইরেই যায় না, সাইকেল দিয়ে কী হবে?

দুপুর থেকে রাত দশটার মধ্যে পরিবারের প্রায় সবাই জিজ্ঞাসা করেছে, কত দিন থাকব। আমি হেসেছি। কোনো উত্তর দিইনি।

ছয়

আমি যেবার ক্লাস ফাইভে পড়ি, গরমের ছুটিতে আমরা পুরী বেড়াতে গেছিলাম। বাবা পুরীতে ছবি তুলবেবলে ক্যামেরায় ফ্লিম ভরেছিল, তখন একটা রিলে রারোটা ছবি উঠত। বাবার রিলটা ভরে খাটের উপর রেখেছিল, কেউ ঘরে ছিল না, অ ামি পরপর আমার জিনিস তিনটের ছবি তুলেছিলাম। পুরীতে সবার সঙ্গে যাওয়া সত্ত্বেও, আমার একটাও পুরীর ছবি নেই। পুরীতে সবাই আছে, আমি নেই। কারণ আমি যে তিনটে ফ্লিম নষ্ট করেছি।

তবে ছবি ছাপা হওয়ার পর সবাই যেমন নিজের নিজের ছবি পেয়েছিল, নিজের তোলা তিনটে ছবি পেয়েছিলাম।

ভাইপো আর ভাইঝিকে ছবি তিনটে দেখালাম, ওরা দেখেই চিনতে পারল, আমি কিছু বলার আগেই টানতে টানতে

উপরে নিয়ে গেল, চিলেকোঠার দরজা খুলতেই ভ্যাপসা গন্ধের সঙ্গে চোখে পড়ল টেবিলের উপর চেয়ারটা দাড়িয়ে আছে।

ভিতরে ঢুকলাম, টেবিলের উপর থেকে চেয়ারটা নামালাম, ঝেড়ে পুছে টেবিলটার মুখোমুখি বসলাম। চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজতেই, বড়মামা, গুদেব, মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য, ঔরঙ্গজেবের গল্প, ড্রয়ার খেলা, এমনকি বাঘের পা কাটা পর্যন্ত পরপর সামনে এসে যাচ্ছিল।
চোখ খুলতেই দেখি ওরা আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।
হেসে বললাম, টেবিলের একটা মজা আছে জানিস?
ওরা মাথা নেড়ে জানাল, জানি।
---চেয়ারটা কার জানিস?
একসঙ্গে বলে উঠল, ঔরঙ্গজেবের।
সাত
পরদিন বাবাকে আর মাকে প্রণাম করে বললাম, আমি তাহলে আসি?
মা বলল, কাল এলি আজই যাবি?
বাবা বলল, তোর সঙ্গে তো কথাই হল না।
ভাইয়ের বৌ বলল, মোটে একদিনের জন্য এলেন?
ভাই বলল, কাল অফিস ছিল ভালো করে বাজারও করতে পারিনি। আরেকটা দিন থেকে যা।
ভাইঝি জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাচ্ছো?
ওকে আদর করতে গিয়ে কানেকানে বললাম, ফটোগ্রাফের দেশে।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com